বাংলাদেশের হৃদয় হতে

বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে

মেমরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউফাউন্ডল্যান্ড এর

বাংলাদেশ স্টুডেন্টস’ অ্যাসোসিয়েশান প্রকাশিত

স্মরণিকা

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

সম্পাদনায়

অমিত

ডিসেম্বর, ২০১১

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ স্টুডেন্টস’ অ্যাসোসিয়েশান

প্রচ্ছদ

জয়নুল আবেদিনের ১৯৭১ শীর্ষক চিত্র অবলম্বনে

অলঙ্করণ ও বর্ণবিন্যাস

অমিত

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১১।

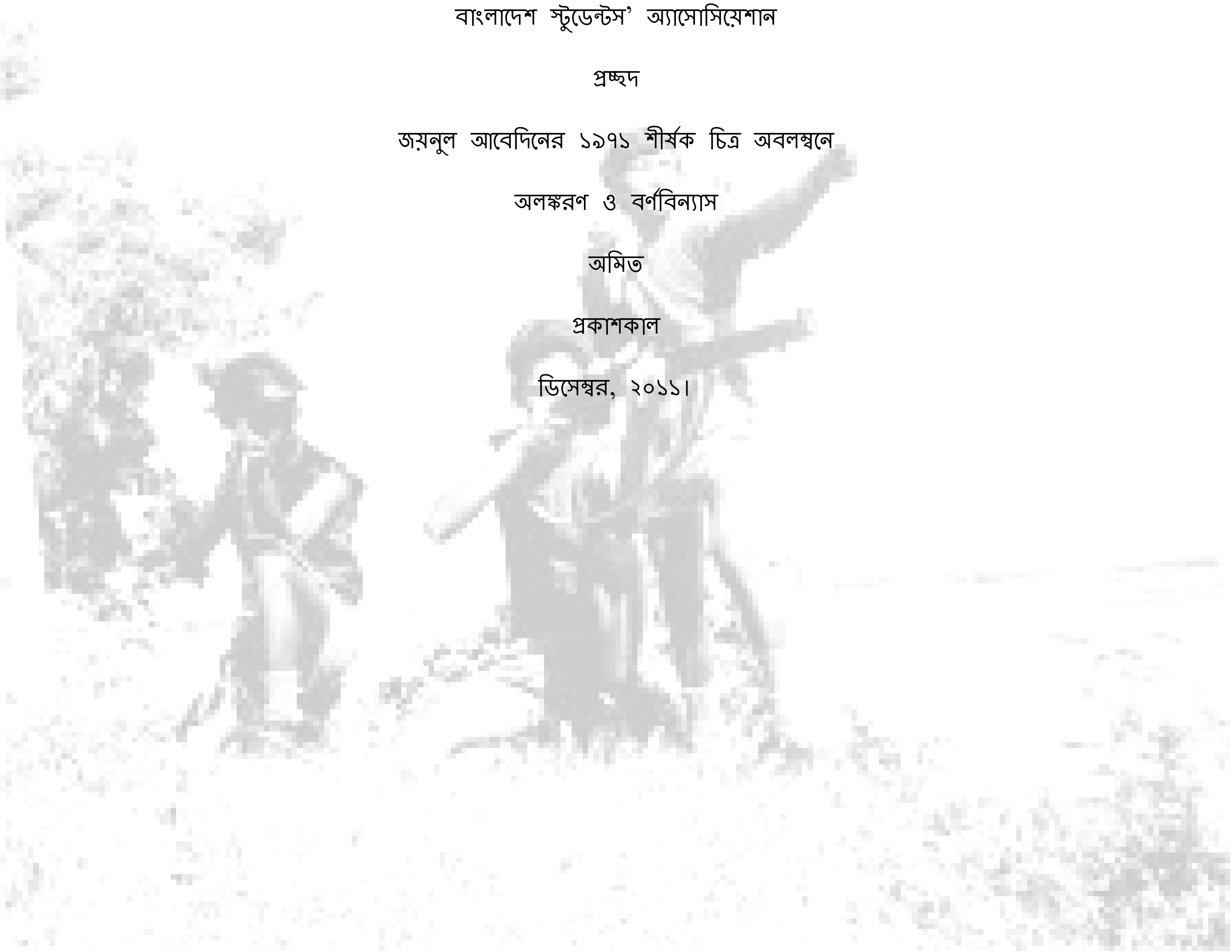

প্রস্তাবনা

একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের পাড়ায় পাড়ায় লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের খুব চল ছিল। যেকোনো বিশেষ দিন উপলক্ষ করে স্মরণিকা প্রকাশ ছিল নৈমত্তিক ব্যাপার। স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ছিল সাহিত্য অনুরাগী মানুষের আবেগ প্রকাশের অন্যতম জায়গা। এরপর ধীরে ধীরে প্রযুক্তি এসে দখল করল কাগজের স্থান। আজকাল আমরা আর কাগজে লিখি না, লিখি ফেসবুকে, লিখি ব্লগে। এসএমএস লিখি, কবিতা লিখি না। অনেকে হয়ত যুক্তি দিবেন এতে করে লেখার সংখা বাড়ছে, বাড়ছে লেখকের সংখ্যা। কিন্তু সেই আবেগ, সেই অনুভুতি কী পাওয়া যায় ভার্চুয়াল লেখায়। এখানে লেখাটা ছিল মূল, কিন্তু তা প্রকাশের প্রত্যেকটা ধাপও কি কম আনন্দের ছিল। প্রুফ দেখা, পেজ মেকাপ, বিজ্ঞাপন আনা, প্রচ্ছদ আরো কত কী। একটি পত্রিকাকে ঘিরে কতোগুলো হৃদয় এক হয়ে যেত।

আজ বাংলাদেশের বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তি। দেশের মাটিতে কত আনন্দই না হচ্ছে বিজয় দিবসকে ঘিরে। সুদূর পরবাসে বসে সেই আনন্দকে ছুঁতে না পারার কষ্টটাকে একটু লাঘব করার প্রয়াসে বাংলাদেশ স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশান এর কালচারাল উইং উদ্যোগ নিয়েছে ছোট পরিসরে একটি পত্রিকা প্রকাশের। প্রবাসে বিজয়ের আনন্দ - এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পত্রিকা প্রকাশ। এই ছোট্ট আয়োজন ভবিষ্যতের বড় পরিসরের উদ্যোগকে পথ দেখাবে এটাই প্রত্যাশা। আর এই প্রয়াস যদি কারও মনে একটু হলেও দোলা দিতে পারে তাই হবে আমাদের স্বার্থকতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীর সেনানীদের প্রতি আকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সালাম।

বিজয়ের আনন্দ ছুঁয়ে যাক সবার হৃদয়। এই কামনায়।।

যাদের নিঃস্বার্থ বলিদানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা

শুধুই একটি অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি,

হয়ে উঠেছে আত্মত্যাগের এক বিমূর্ত প্রতীক,

পেয়েছে অমরত্ব......

সেই সাত মহান বীরের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।।

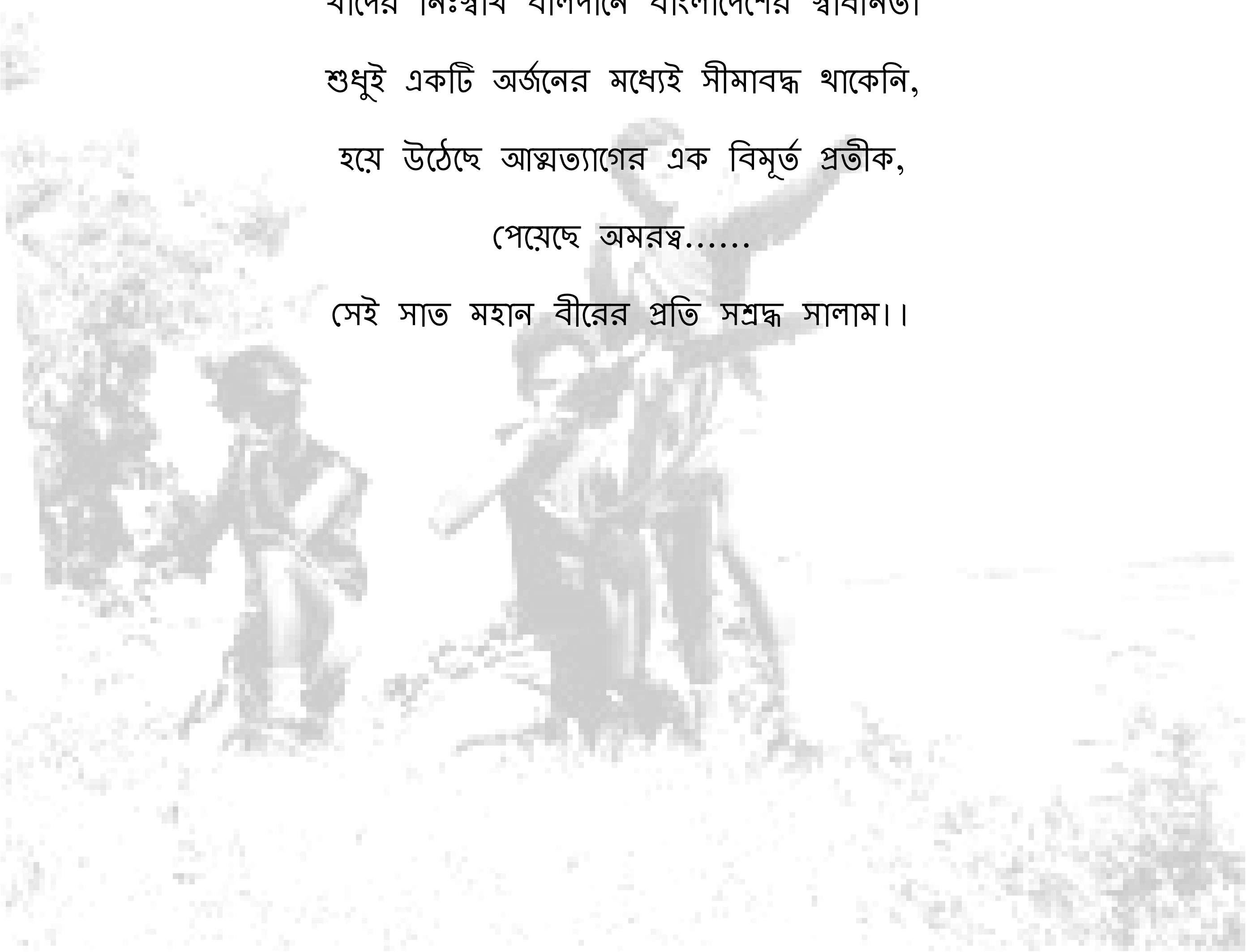

বিজয়ের এই দিনে

ডিসেম্বরের ভোর বয়ে আনে মিষ্টি রোদের পরশ। কুয়াশার স্বচ্ছ আবরণ চারপাশের চেনা পরিবেশ--কেও কেমন অচেনা করে তোলে। শীতের এই আমেজ মানুষকে এখন আর আকর্ষণ করে না, আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে সবাই। যুদ্ধের টানটান উত্তেজনার মধ্যে সাময়িক বিরতি নেমে এসেছে বটে, তবে মাথার ওপর ঝুলছে খড়্গ। সকাল সাড়ে নয়টায় শেষ হবে মিত্রবাহিনী প্রদত্ত আলটিমেটাম।পাকিস্তানি পক্ষ থেকে এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে কি শেষ পর্যন্ত ঢাকা জয়ের জন্য শুরু হবে সর্বাত্মক আক্রমণ, সূচিত হবে ব্যাটল অব ঢাকা? নাকি অনন্যোপায় পাকিস্তানি বাহিনী মেনে নেবে হার, ঘটবে যুদ্ধের সমাপ্তি? এভাবেই শুরু হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বরের দিন।

ভারতীয় কম্যান্ড হেডকোয়ার্টারে ফিল্ড মার্শাল মানিকশ তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সর্বাত্মক আক্রমণ শুরুর। এই সময় ঢাকা থেকে পৌঁছায় আত্মসমর্পণের বার্তা এবং পাকিস্তানি পক্ষ থেকে প্রার্থনা জানানো হয়, যুদ্ধবিরতির সময় যেন আরও ছয় ঘণ্টা বাড়ানো হয়। সেই সঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতীয় সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়।
যৌথ বাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিল দুই প্রান্ত থেকে, মেজর জেনারেল জি সি নাগরার ছত্রীসেনাদল আসছিল টাঙ্গাইল-মির্জাপুর হয়ে, সঙ্গে ছিল কাদের সিদ্দিকীর গেরিলা যোদ্ধাদল। আর মেজর জেনারেল গনজালভেসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল মেঘনা পাড়ি দিয়ে, তাদের সঙ্গে ছিল দ্বিতীয় ও একাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সকাল নয়টায় জেনারেল নাগরা মিরপুরে তুরাগ নদের প্রান্তে পৌঁছে বার্তা পাঠান নিয়াজিকে, 'মাই ডিয়ার আবদুল্লাহ, আমি এসে গেছি, তোমার খেলা এখন শেষ। আমি বলছি, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো, আমি তোমার দেখভাল করব।'

ইস্টার্ন কম্যান্ড হেডকোয়ার্টারে এই বার্তা পৌঁছতেই আত্মসমর্পণ বাস্তব হয়ে ওঠে পাকিস্তানি জেনারেলদের কাছে। এত দ্রুত যে মিত্রবাহিনী ঢাকা পৌঁছে যাবে, সেটা ছিল তাঁদের কল্পনারও বাইরে। ফরমান আলী ভেবেছিলেন, এটাই বুঝি সেই অগ্রবর্তী দল, যারা আত্মসমর্পণের ব্যবস্থাদি তদারক করবে। সেই দল অবশ্য মেজর জেনারেল জ্যাকবের নেতৃত্বে ঢাকায় আসার জন্য কলকাতায় তখন প্রস্তুতি সারছিল। মেজর জেনারেল নাগরাকে সাদরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসার জন্য মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠানো হলো মিরপুরে। সকাল ১০টার মধ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এসে পৌঁছালেন মেজর জেনারেল নাগরা, সঙ্গে সামরিক পোশাকে কাদের সিদ্দিকী, যাঁর উপস্থিতি বাড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর হৃদকম্পন।

বিকেল চারটা ৩১ মিনিটে স্বাক্ষরিত হলো আত্মসমর্পণের দলিল, বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাভ করল পরিপূর্ণতা, ঢাকা হয়ে উঠল 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী', সম্পন্ন হলো বাংলাদেশের বিজয়।

দলিলে স্বাক্ষরদানের পর নিয়াজি তাঁর পিস্তল তুলে দিলেন জেনারেল অরোরার হাতে। রেসকোর্সের সবুজ বিস্তার শ্যামল বাংলার অভ্যুদয়ের জন্য মেলে দিয়েছিল বুক। এই রেসকোর্সের ময়দানেই নয় মাস আগে জাতির অবিসংবাদিত নেতা উদ্দীপ্ত ভাষণে বলেছিলেন, ‘রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব।’ রক্ত দিয়ে কেনা সেই মুক্তি আজ পল্লবিত হলো সেই একই ময়দানে। উদ্ধত পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী তাঁর টেবিলের ক্যালেন্ডারে লিখেছিলেন হন্তারক শপথ, ‘পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে ঢেকে দেয়া হবে লালে।’ কী বিপুল রক্তস্রোতই না বইয়ে দিয়েছিল তারা!

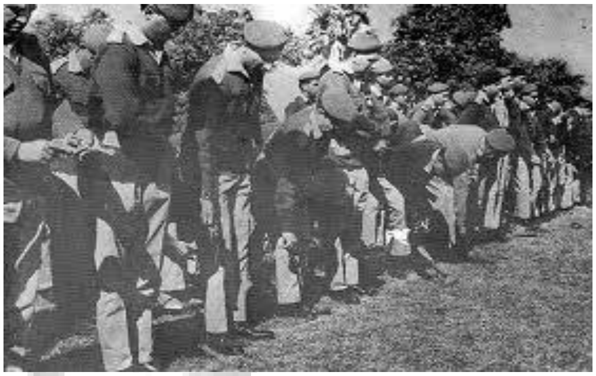

মনে হবে, কী দুর্ভাগা সেই দেশ, যার বাস্তবতা বোঝাতে রক্তশব্দস্রোত বইয়ে দিতে হয় সাহিত্যশিল্পীকে। এই রক্তস্রোত উজিয়েই তো বাঙালি এসে পৌঁছেছিল বিজয় দিবসে, আত্মসমর্পণের মাহেন্দ্রক্ষণে, যুগ যুগ ধরে নন্দিত হবে যে সফলতা। অশেষ দুঃখ-জড়িত বিজয় দিবস তাই বিপুল আনন্দেরও ক্ষণ। যে রক্তধারায় সিঞ্চিত হয়েছে মাটি, সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে অনিন্দ্য এক রক্তকুসুম, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, যে দেশের বিজয়তিথি কীর্তিত হবে যুগ থেকে যুগে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। এখন ৪০ বছর পর নতুন প্রজন্ম বিপুলভাবে বরণ করতে চাইছে মুক্তিযুদ্ধকে, বিজয়ানন্দে মেতে উঠছে তারা। গানে কবিতায় নাটকে চলচ্চিত্রে আলোচনায় আড্ডায় উত্সবে সাজপোশাকে নতুনভাবে বরিত হচ্ছে বিজয়, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে সার্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে।

এই তো আমাদের বিজয় দিবস, জীবন গড়ার সাধনার মধ্য দিয়ে রক্তঋণ পরিশোধের বাণী বহন করে ফিরে ফিরে আসে আমাদের জীবনে, সঞ্চারিত হয় প্রবীণ থেকে নবীনে, পায় নতুন ভাষা, রূপায়িত হয় নতুন কথায় ও সুরে, ভাবে ও ভাবনায়। দিনটি তাই কেবল অতীতের নয়, আগামীরও।

এক নজরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

মেয়াদ – ২৬ শে মার্চ -১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১।

স্থানঃ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)

প্রতিপক্ষঃ পশ্চিম পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী।

ফলাফলঃ ৯০ হাজার সেনা সমেত পশ্চিম পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ । স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

মুক্তিবাহিনীর প্রধানঃ জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি উসমানী।

সেক্টর সংখ্যাঃ ১১।

সাবসেক্টরঃ ৬৪।

বিশেষ বাহিনীঃ ৩। জেড, কে এবং এস ফোর্স।

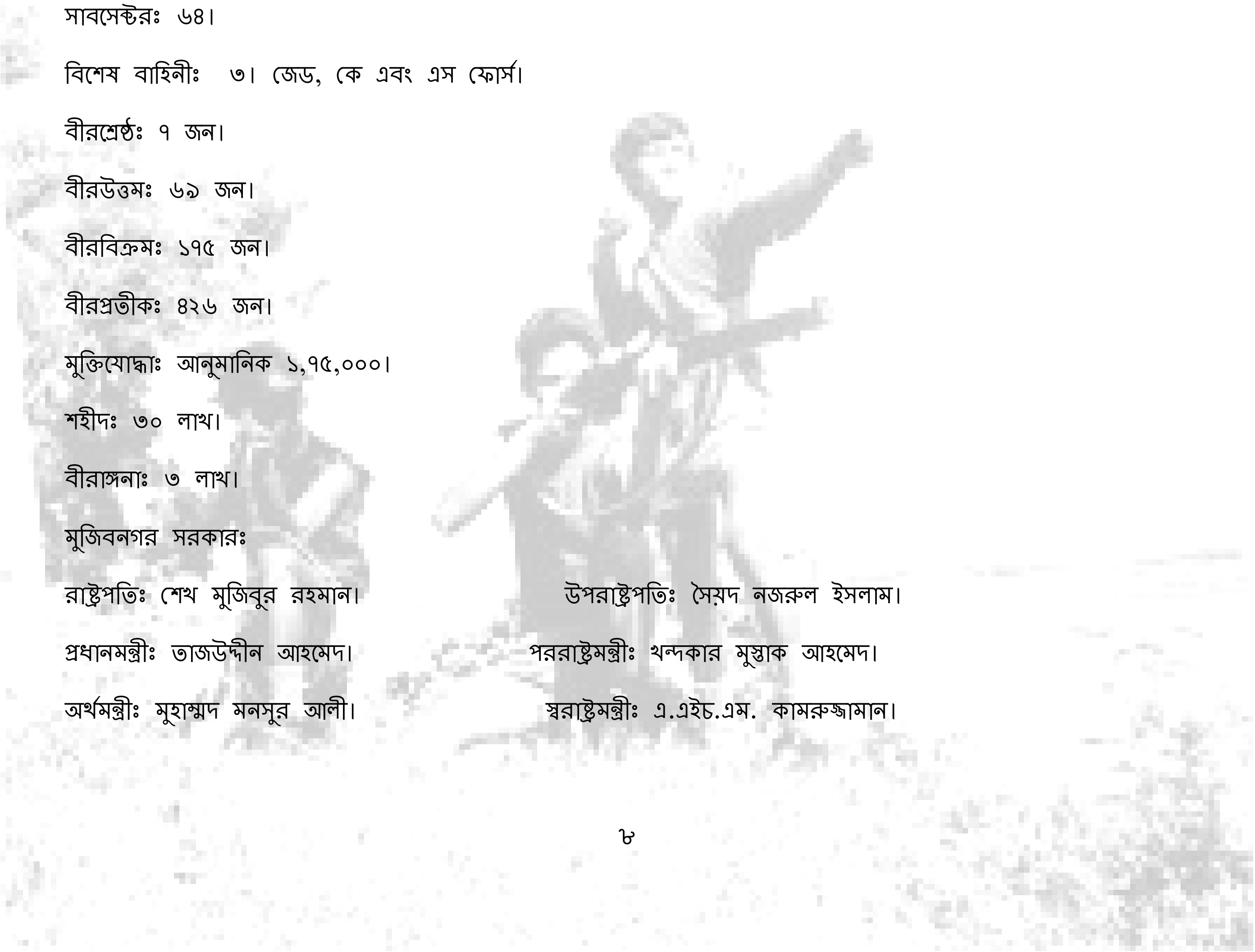

বীরশ্রেষ্ঠঃ ৭ জন।

বীরউত্তমঃ ৬৯ জন।

বীরবিক্রমঃ ১৭৫ জন।

বীরপ্রতীকঃ ৪২৬ জন।

মুক্তিযোদ্ধাঃ আনুমানিক ১,৭৫,০০০।

শহীদঃ ৩০ লাখ।

বীরাঙ্গনাঃ ৩ লাখ।

মুজিবনগর সরকারঃ

রাষ্ট্রপতিঃ শেখ মুজিবুর রহমান।

উপরাষ্ট্রপতিঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রীঃ তাজউদ্দীন আহমেদ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীঃ খন্দকার মুস্তাক আহমেদ।

অর্থমন্ত্রীঃ মুহাম্মদ মনসুর আলী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঃ এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান।

আত্মসমর্পণের দলিলঃ

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

জন্ম

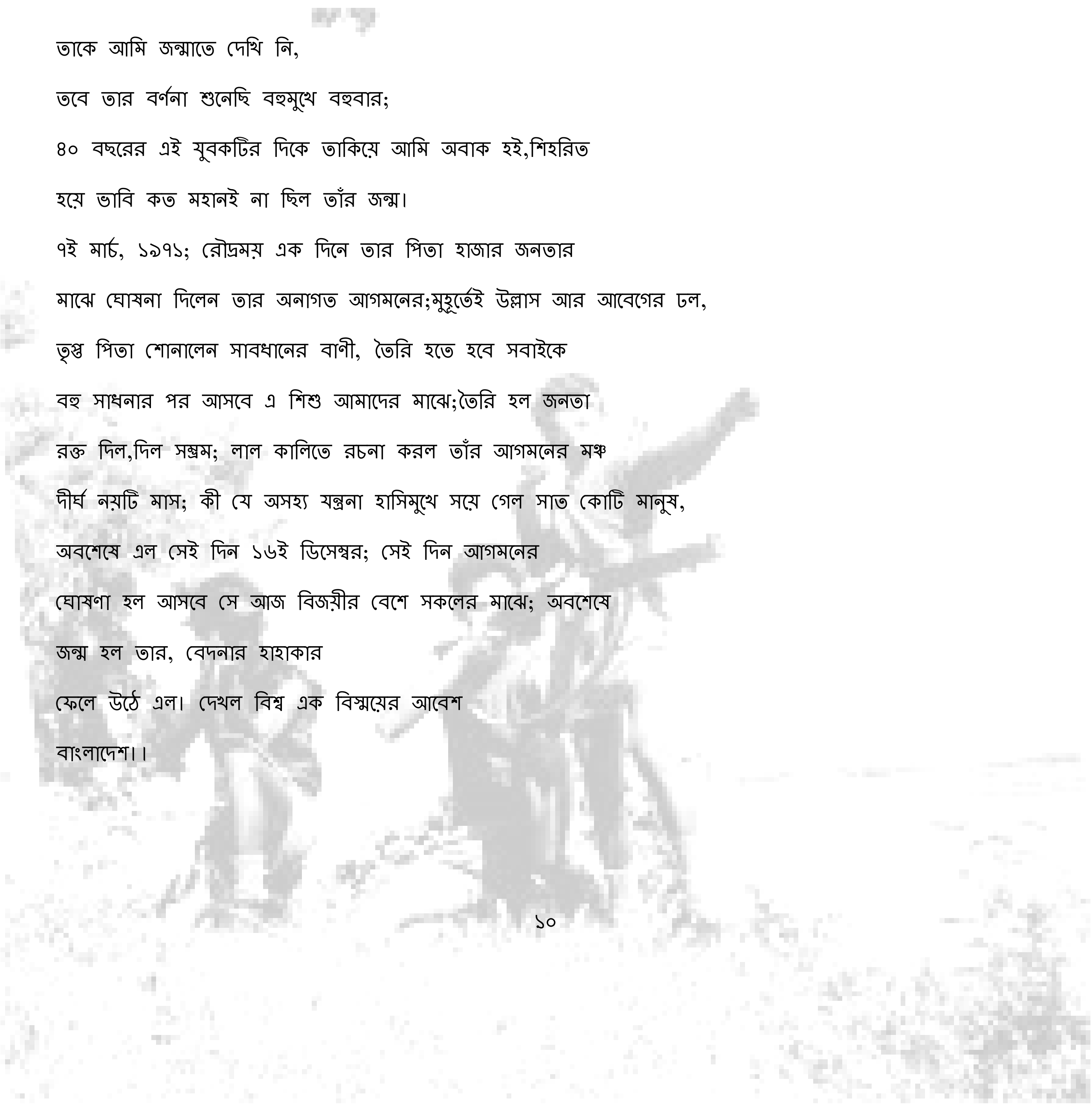

তাকে আমি জন্মাতে দেখি নি,

তবে তার বর্ণনা শুনেছি বহুমুখে বহুবার;

৪০ বছরের এই যুবকটির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হই,শিহরিত

হয়ে ভাবি কত মহানই না ছিল তাঁর জন্ম।

৭ই মার্চ, ১৯৭১; রৌদ্রময় এক দিনে তার পিতা হাজার জনতার

মাঝে ঘোষনা দিলেন তার অনাগত আগমনের;মুহূর্তেই উল্লাস আর আবেগের ঢল,

তৃপ্ত পিতা শোনালেন সাবধানের বাণী, তৈরি হতে হবে সবাইকে

বহু সাধনার পর আসবে এ শিশু আমাদের মাঝে;তৈরি হল জনতা

রক্ত দিল,দিল সম্ভ্রম; লাল কালিতে রচনা করল তাঁর আগমনের মঞ্চ

দীর্ঘ নয়টি মাস; কী যে অসহ্য যন্ত্রনা হাসিমুখে সয়ে গেল সাত কোটি মানুষ,

অবশেষে এল সেই দিন ১৬ই ডিসেম্বর; সেই দিন আগমনের

ঘোষণা হল আসবে সে আজ বিজয়ীর বেশে সকলের মাঝে; অবশেষে

জন্ম হল তার, বেদনার হাহাকার

ফেলে উঠে এল। দেখল বিশ্ব এক বিস্ময়ের আবেশ

বাংলাদেশ।।

আমি বিজয় দেখেছি

এক এক করে পার হয়ে গেল চল্লিশটি বছর
সেদিন সেই যুবকদের শরীরে আজ বৃদ্ধের চাদর
তবু যক্ষুনি আমি শুনতে চেয়েছি সেই কাহিনী
মনে হয়েছে যেন আমি দিয়েছি তাদের এক সঞ্জীবনী
যুবকের উচ্ছ্বাসে তারা করেছে বর্ণনা
যেন চল্লিশ বছর নয় কালকের ঘটনা।
অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে থেকেছি সেই মুখপানে
এক স্বর্গীয় আনন্দ যেন আমি দেখেছি সেখানে
আমি যুদ্ধ দেখিনি,আমি বিজয় দেখিনি
তবু আমি তাদের উচ্ছ্বাসে গলা মিলিয়ে
আমি আজ বলতে পারি
আমি বিজয় দেখেছি।।

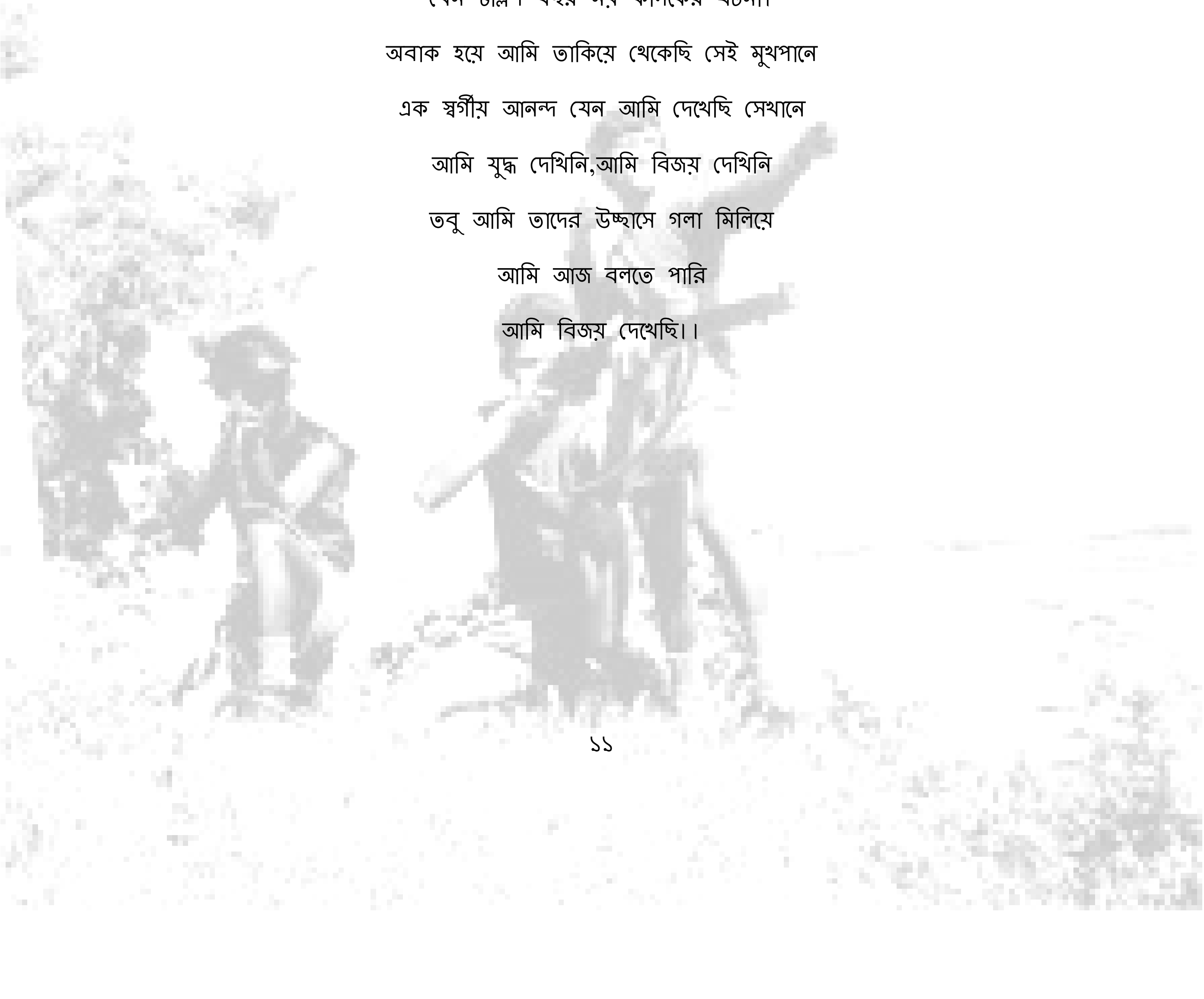

বিজয়কথা

আমি তোমার শুনিয়ে যাব বাংলাদেশের গান
নাই বা থাকুক হারমোনিয়াম, না হোক অনুষ্ঠান
তোমায় আমি বলব আজি যুদ্ধজয়ের কথা
হোক না তোমার জ্বর সর্দি, হোক না মাথাব্যাথা
ত্রিশ লক্ষ শহীদ শুনে আঁতকে তুমি ওঠো
ভেবে দেখ নয়টি মাসেই করল তারা এতো।
আর কিছুদিন থাকলে বল থাকতো না আর কিছু
তাইতো যত মুক্তি সেনা হটছিল না পিছু।
তিন লক্ষ বীরাঙ্গনার শুনতে কি পাও কষ্ট
যুদ্ধ এত নয়ত সহজ এটাই সুস্পষ্ট।
শুনবে তুমি বাংলাদেশের বিজয় কলরব
দাও ফেলে সব মিথ্যা মায়ায় মোড়ানো বাস্তব।
বিজয় শুধু নয়তো আমার
নয়তো শুধুই তোমার
বিজয় তুমি দেখবে এবার
লক্ষ জনতার।।

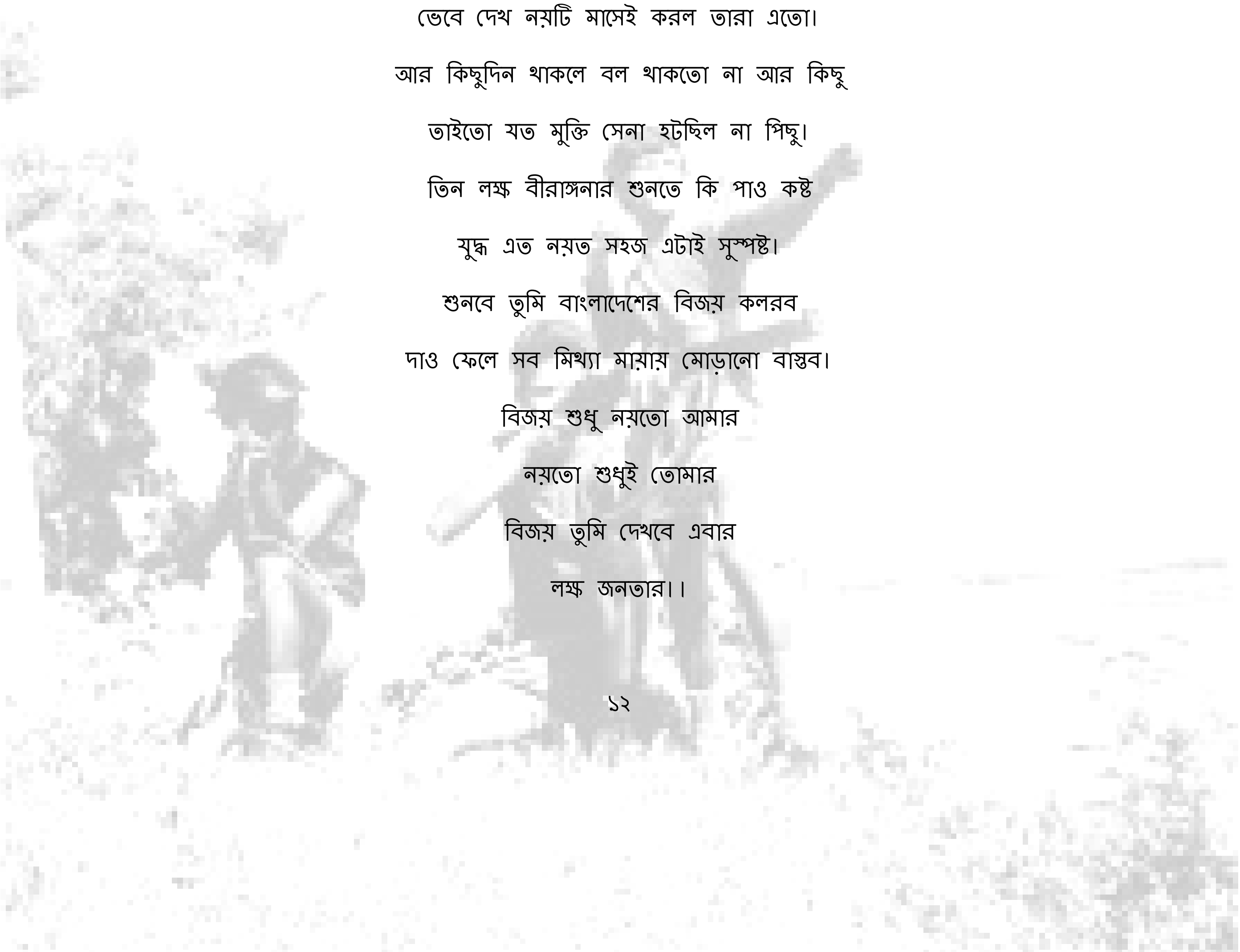

অর্ঘ

লক্ষ শিশু চেয়ে আছে আকাশের পানে
মিশে যাওয়া পেট আর বড় বড় চোখ নিয়ে
যশোর রোডের ধারে-বাঁশের ছাউনিতে
যেখানে বালির সমুদ্রে বিসর্জনের গন্ধ।

বৃষ্টিতে ভেজা অসহায় পিতা
অথবা যন্ত্রণাকাতর লাখো মা
কিংবা বিষণ্ণ ভাই বোনের
নেই কোন আশ্রয়ের স্থান।

হাজারো দুহিতা হেঁটেছে মেঠোপথে
হাজারো শিশু ভেসে গেছে বানের জলে
গৃহহীন হওয়া হাজারো বিমর্ষ বৃদ্ধ
অথবা নির্বাক বৃদ্ধারা পাগলপ্রায়।।

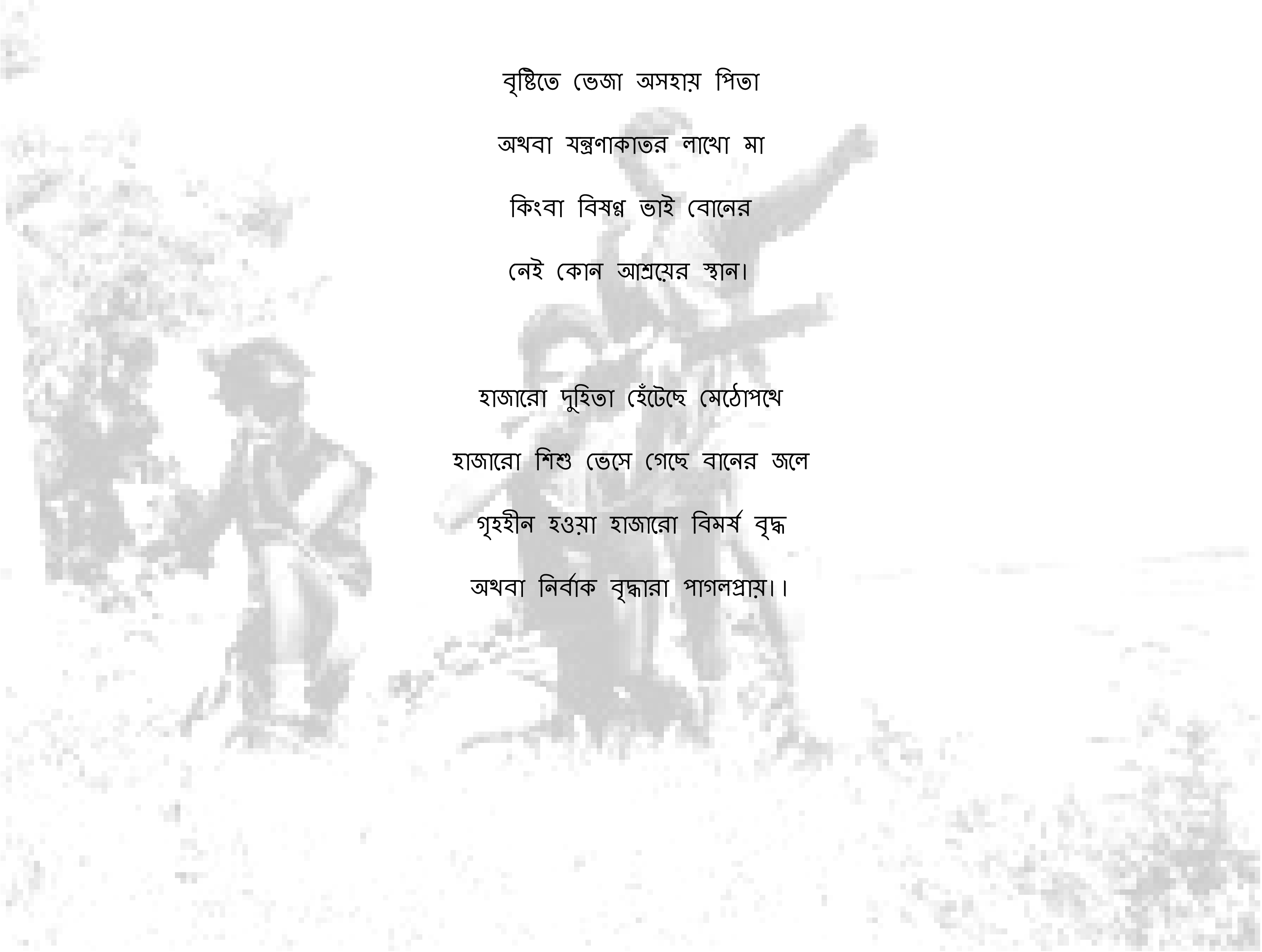

লাখ আত্মা একাত্তরে

ধূসর সূর্যের নিচে যশোর রোডের ধারে

মরে গেছে লাখো, লাখো

চলে গেছে কলকাতার পথে।।

আর কত পিতা বিমর্ষ হয়ে রবে

আর কত সন্তান খুঁজে পাবে না যাবার ঠিকানা

কত মেয়ে পাবে না খেতে,কত মানুষ

মৃতপ্রায় হয়ে রইবে পড়ে? আর কত?

(অ্যালেন গিনসবার্গ রচিত “সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড” কবিতা থেকে অনুদিত।)

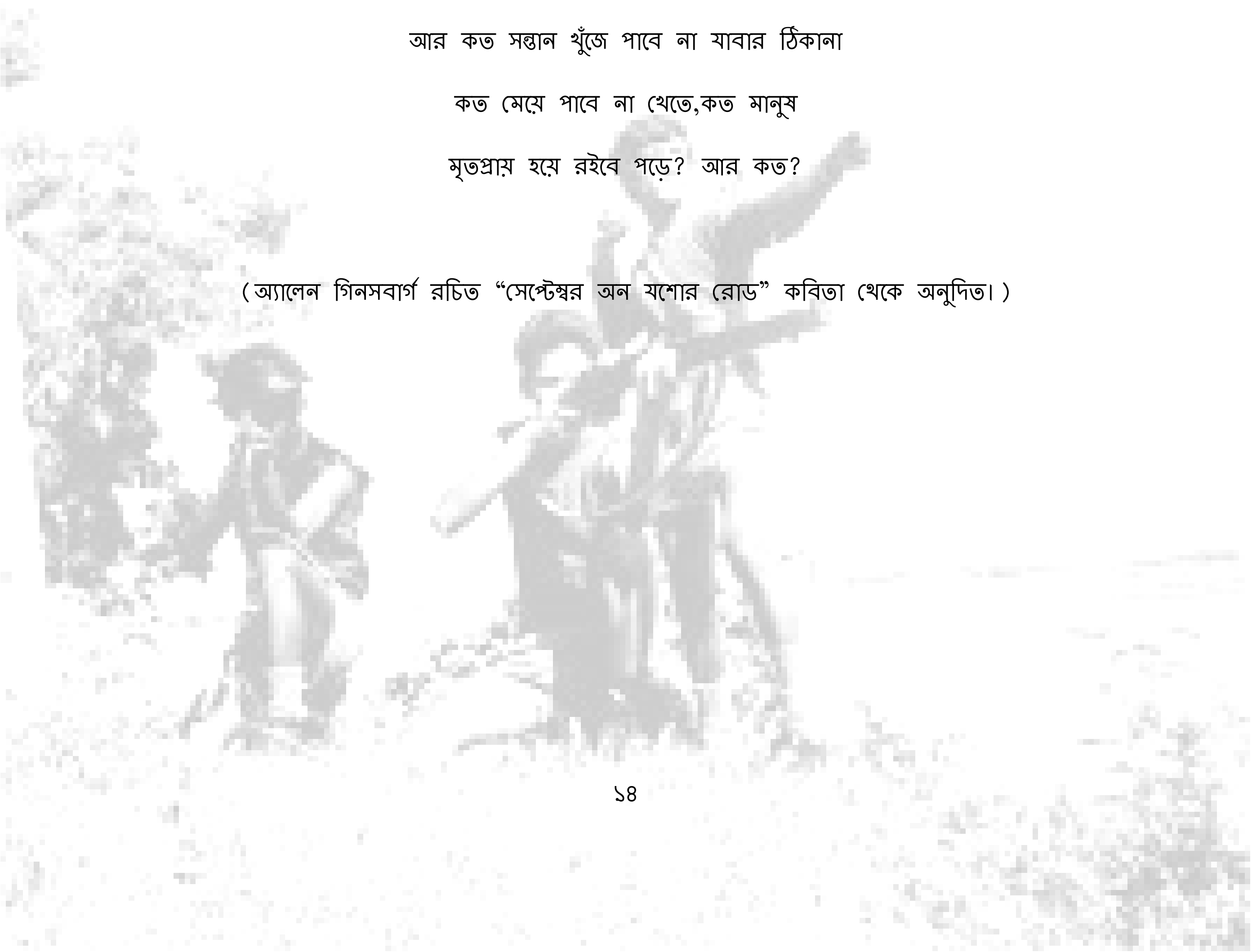

প্রেমের সংজ্ঞা

মুস্তাফিজ

ইদানিং নাকি বন্ধু হয়েই,
হচ্ছে সবার প্রেম !
প্রেমের সংজ্ঞা সুদূরপ্রসারী,
এটাই মডার্ন থিম্ !

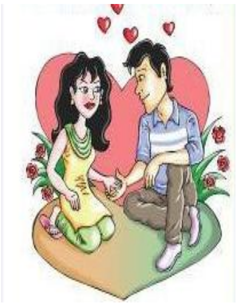

বন্ধুর কাছে সব বলা যায়
করা যায় সব শেয়ার,
এটাই নাকি ইন্টিমেসির
প্রাইমারি অ্যাফেয়ার !

আমার যখন মনটা খারাপ
দুঃখে আমি কাতর,
তোর কাঁধটাই সুইটেব্‌ল
যেন নরম চাদর !

আমার সুখেই আছিস যে তুই
আছিস আমার দুখে,
তোর বিয়েতে থাকব আমি
থাকব যে তোর সুখে !

আরো অনেক বিষয় আছে
ইম্পরট্যান্ট ম্যাটার্ !!
সবার কাছে বলব নাতো,
প্রাইভেসি'র ব্যাপার !!!

তুই যে আমার প্রানের বন্ধু
তোকে ছাড়া সব মিছে,
জীবনে মরণে থাকব যে আমি
সারাক্ষণ তোর পিছে !

যদি কখনো তুই চাস তবে
আসব যে তোর কাছে,
তখনো কিন্তু বন্ধুই রবো,
তোর জামাইয়ের পাশে !

আমার জন্যে ভাবিস না তুই
থাকব আমি সুখে
আমার এমন অনেক বন্ধু
রাখে আমায় বুকে

রাজাকার

আমিন শিমুল

লেপের ভিতর মুড়ি দিয়ে শুয়ে সোহেল অস্বস্তি বোধ করছে। আর মাত্র তিনদিন বাকি। অথচ লেখার কিছুই ঠিক করতে পারছে না। বিজয় দিবস সংকলনে তার লেখাটা যাওয়া দরকার যতটা তার নিজের জন্য ততোটাই সংকলনের জন্যও। অথচ চিরচেনা কিছু ছবির বাইরে কিছুই সে আঁকতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার নায়ক ভিলেন সমাচার শেষে অবশেষে যা দাঁড়ায় তা হলো বাংলা সিনেমা। বহুল চর্চিত পথ থেকে বের হবার আকুতি তার মাঝে প্রবল। এ মুহূর্তে অবশ্য গল্পলেখনজনিত অস্বস্তির চেয়েও বেশি ঝামেলা হয়ে দাড়াচ্ছে জমিয়ে পড়া ঠাণ্ডা। কুয়াশার চাদর বাইরে যেমন ঢাকা রুমটাকেও তার কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হয় একসময়।

-লেখক সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

ছটফট করে সে তাকায়। না রুমে কেউ নেই। নিশ্চয়ই তার মনের ভুল। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তার মাঝে নানা রকম উদ্ভট কল্পনার জন্ম দিচ্ছে হয়তো।

-লেখক সাহেব। ও লেখক সাহেব।

শব্দের উৎপত্তি লক্ষ্য করে তার চোখ চলে যায় রুমের ঘুলঘুলিতে ঝুলন্ত ছায়ামূর্তির দিকে। ভালো করে চোখ কচলে তাকায়। না কোন ভুল নেই। ছায়া মূর্তিটিই কথা বলছে।নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে সোহেল। ছায়া মূর্তিকে অগ্রাহ্য করে লেপে মুড়ি দিয়ে তার মাথা থেকে সব উদ্ভট চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চায়।

-আরে লেখক সাহেব মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে তো বহুত লিখলেন, রাজাকারের গল্প না লিখুন শুনবেন তো।

এবার ছায়ামূর্তি আর ঝুলে নেই। তার বিছানায় একেবারে তার পাশেই বসে আছে।লেপের ভিতর থেকেই।

সোহেলের প্রশ্ন, ভাই কে আপনি?

-আমি রাজাকার।তবে বিষাক্ত গোখরা না নিরীহ ডোরা সাপ।

এবার সোহেল লেপের ভিতরে থেকেই উঠে বসে। এই ছায়ামূর্তি আপাতত কোন ক্ষতি করবে না তা সে ধরেই নিয়েছে।

-কী বলবেন বলেন। সময় নেই ঘুমাবো। সকালে উঠে কাজে বসতে হবে।

-হা হা হা । কেমন অস্ফুটস্বরে ছায়ামূর্তি হাসলো। কী কাজ!!! গল্প লিখবেন। মুক্তিযোদ্ধারা কত কষ্টে আছে, কে রিকশা চালায়, কে চা বেচে -- এমন খবর যোগাড় করবেন তারপরে সেটা ছাপিয়ে বাহবা কুড়াবেন। তারপরে !! তারপরে আপনারা কিংবা আপনাকে হাততালি দেয়া সুশীলেরা সবাই ভুলে যাবে সে লোকটির কথা । সময় এগিয়ে যাবে। বছর ঘুরবে তারপরে আবার সেই লোককেই কুমীরের দ্বিতীয় ছানা হিসাবে দেখাবেন। বাহবা কুড়াবেন। বেশ বেশ।

-ঐ শালা রাজাকারের বাচ্চা!! এত কথা কস কেন।আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়া যা খুশি তাই করি, তোর এত চুলকায় কেন। তুই তো শালা রাজাকার।

-একটু ভুল হয়ে গেল না। আমি রাজাকার কিন্তু আমার বাপ তো রাজাকার ছিলো না। আর জানেন মশায় আমার ছেলেও ৭১ এ মারা গেছে পাকিদের হাতে।

সোহেলের মেজাজ এইবার গরম হয়ে উঠলো শালার রাজাকারটা আবার তার থেকে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে।বিরস বদনে সে বললো,

-অহ তুমি তোমার ছেলের বীরত্ব গাঁথা কইতে আইছো। বেশ তো বলো।

-না না কী যে বলেন। ছেলের বীরত্ব থাকলে ঐটা তার। আমি তো আমার কথা বলতে আসছিলাম লেখক সাহেব।আপনি না শুনলেও আমি বলতে থাকবো।

-বুঝলেন মশায়, শুনেন তাহলে।একাত্তর সাল চলে তখন। উহহ সে কী উত্তেজনা । সে কী অবস্থা। শহর হতে দলে দলে লোক পালিয়ে আসতে থাকে আমাদের গ্রামে। মানুষের মুখে আমরা শুনতে থাকি বীভৎসতার কথা, নির্যাতনের কথা।আমাদের গ্রাম থেকে যেসব নৌকা বাইরে যেত তাদের গতিবিধি ক্রমশ সীমিত হয়। তাদের কাছ থেকে খবর শুনতে থাকি আর্মি আসার। আর্মি ঐ গ্রামে হানা দিছে, ঐ গ্রামে বাড়িঘর পুরাচ্ছে এসব খবর নিত্যনৈমিত্তিক হতে থাকে। গ্রামের মোড়ল সেলিম ভাই। লম্বা জোয়ান চেহারা।উনি বলতে থাকেন, শালার মুরতাদগো লাইগা আমরা কষ্ট পাইতেসি। কী আর করা যাবে। যেসব মুসলিম এভাবে হিন্দুদের প্ররোচণায় মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যাবে তাদের এই পরিণতি হবে। আমরা সাচ্চা মুসলিম। এই গ্রামে আসলে কোন চিন্তা নাই।

-বুঝলেন লেখক, আমার পোলাটা তখনও ভালো মতে বুঝে না । ডানপিটে, এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। আমার বড় মেয়েটা তখন স্কুলে পড়ে এইটে। আর্মিরা মাইয়াছেলেগো নিয়া কী করে করে সেসব শুনে আমার নিজের মেয়ের জন্য চিন্তা হয় বহুত। তারপরে, সকল ভয় আশঙ্কা সত্যি করে একদিন আসলেই আর্মি আসে। লোকজন কেউ নামাজে দাঁড়ায় কেউ কোরআন শরীফ পড়ে। তার মাঝে আমরা খবর পাই আর্মি দুই তিনজনরে পথেই সাবাড় করছে। সেলিম ভাই কয়, মিয়া দেখো কি? গ্রামরে বাঁচাইতে হইলে স্কুলের উপরে উঁচা কইরা পাকিস্তানের পতাকা তোল। আমার মনে কোন দেশপ্রেম ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা হইবার মতো সাহসী হইতে পারি নাই।

তারপরেও যারা দেশী লোকগো মারতাসে তাগো পতাকা তুলতে কেমন লাগলো। সেলিম ভাই ঝাড়ি মারে, ঐ মিয়া গ্রাম সাফা হইলে পতাকা তুলবা। তারপরে, তখন হঠাৎ কইরা আমার মেয়ের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। পতাকা তুলে দেই উঁচা করে। আমরা কয়েকজন মিলে জোরে জোরে আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর দেই। জানো লেখক, আমাদের এই কাজে পুরা গ্রাম বেঁচে যায়।

ছায়ামূর্তি একটু অবসর নেয়। সোহেল কিছুটা গোছানোর চেষ্টা করে ব্যাপারটা। সে কিছু বলে উঠার আগেই ছায়া মূর্তি আবার শুরু করে।

-বুঝলেন লেখক সাহেব, সেদিন আমাদের সেই কাজে সবাই বাঁচল। পাকি সেনারা ক্যাম্প করে তিনদিন থেকে চলে গেলো। আমরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপরে, একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতাসি, কেউ যেনো পিছন থেকে মুখে গামছা চেপে ধরলো। জ্ঞান ফিরলে আমি দেখি আমার হাত পা বাঁধা। আমার পাশে সেলিম ভাই। দাড়িওয়ালা একটা ছেলে আমাদের বললো,

-ঐ তোরা পাকি পতাকা উড়াইসোস।

আমি বললাম উড়াইছি,সেলিম ভাই বলছিলো।

সেলিম ভাইয়ের দিকে ওদের দৃষ্টি পড়ার আগেই দেখি সেলিম ভাই তার কোন শালার নাম কইলো যে কিনা মুক্তি। কার সাথে, কোথায় আছে, সব গড়বড় করে বলে গেলো !!!

সেলিম ভাই ছাড়া পেয়ে গেলো; আর আমি !! ছায়া মূর্তি কথা শেষ করার আগেই ডুকরে উঠলো যেন।

নিজের দেশে রাজাকার হয়া আমি মরলাম। শেষ কথা গুলো করুণ এবং মৃদু হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

-কিন্তু ওরা এত সহজে সেলিমকে ছাড়লো কেন? আর আপনার ছেলে না মুক্তিযোদ্ধা। তার কথা কিছু বলুন। কী হলো? হঠাৎ করেই চমক ভাঙে সোহেলের। সে কার সাথে কথা বলসে? এই লোকই বা কে? ধ্যেৎ বলে ঘুমানোর কাজে প্রস্তুতি নেয়।

পরদিন যখন তার গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনার আমন্ত্রণপত্রে মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমেদের নাম দেখতে পায়, সোহেলের নিজের অজান্তেই তার ভ্রু কুঞ্চিত হয়।

সুগন্ধির খোঁজে

তৌফিক

দরজাটা খুলে বাইরে বেরুতেই ঠান্ডায় হি হি করে উঠল রনি। এখনো নভেম্বর মাস শেষ হয়নি, জাঁকানো শীত পড়ে গেছে এর মধ্যে। আজ অনলাইনে পত্রিকা পড়তে গিয়ে হালকা মেজাজ খারাপ হয়ছে, ৩৫ সেমি তুষার নিয়ে মৌসুমের প্রথম ঝড় আসলো বলে। জ্যাকেটের কলার উপরে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটা শুরু করল ও স্টুডেন্টস' রেসিডেন্টের দিকে। হাঁটার সময় এই এক অভ্যাস রনির, দুনিয়ার হাবিজাবি জিনিস নিয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করা চাই। আর কিছু না পেয়ে মনে মনে আগামীকালকের কার্যতালিকা তৈরী করা শুরু করল। এক নম্বর – মলে যেতে হবে, গরম একটা ওয়াটার প্রুফ প্যান্ট কিনে আনতে হবে। দুই নম্বর– ছাত্রদের এসাইনমেন্টগুলো দেখে শেষ করতে হবে, অনেক দিন ধরে ডেস্কের এক কোণায় পড়ে আছে ওগুলো। তিন নম্বরটা মনে করতে করতেই ট্রাফিক লাইটের সামনে এসে পড়লো, রাস্তা পাড় হতে হবে এখন। ক্যাম্পাসের ব্যস্ততম রাস্তা ওটা, একবার গাড়ি যাওয়া শুরু করলে দুই মিনিটের আগে লাল বাতি জ্বলে না। এতোক্ষণ চুপচাপ দাড়িঁয়ে থাকার চেয়ে বরং একটা সিগারেট খাওয়া যাক, ভাবলো ও। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে, নিয়ন আলোর রশ্মিগুলোর উপর ছড়িয়ে দিল স্লথ মৃত্যুর বায়বীয় দেহ। দুই ঠোঁটে সিগারেটটা চেপে ধরে সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ভরতে যাবে, এমন সময়, কিন্নরী কন্ঠে কে যেন ডাক দিল পেছন থেকে।

"ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ স্পেয়ার স্মোক ফর মি, ডু ইউ?"

পেছনে তাকাতেই একটু ভ্যাবাচাকা খেল রনি।
পাতলা গড়নের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্প্যান্ডাক্স প্যান্টের উপর একটা মিনি স্কার্ট পরে আছে,

উপরে কালো খাটো একটা জ্যাকেট।

নিয়ন বাতির আলোতে ঠিক বোঝা না গেলেও

আন্দাজ করল, চুলের রং সোনালি আর চোখ নীল।

আধো আলো আধো অন্ধকারেও চেহারার মিষ্টি ভাবটা বোঝা যায়। একটু ইতস্তত করল রনি, আন্ডার এজ হলে সিগারেট দিয়ে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে চায় না ও। কিন্তু এরকম একটা সুন্দর মেয়ের মুখের উপর না বলতে হলে যতোখানি কামিনীত্যাগী সন্ন্যাস প্রয়োজন, তা রনির নেই। সুতরাং, হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল মেয়েটার দিকে। দস্তানা খুলে পকেটে ভরে প্যাকেট থেকে একটা শলা বের করে নিল মেয়েটা। চম্পাকলির মতো

আঙ্গুলগুলোর মাঝে আটকে থাকা সিগারেটটাকে এ মুহূর্তে বড় সৌভাগ্যবান বলে মনে হলো রনির। নিজেই পকেট থেকে লাইটার বের করে বাতাসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে রনির দিকে ফিরল মেয়েটা।

"বাই দ্য ওয়ে, মাই নেইম ইজ এশলি এন্ড মাচ অবলাইজড ফর দ্য স্মোক।"

ফ্রেসম্যান অথবা সফোমোর ইয়ারে ছাত্রী হবে হয়তো – মনে মনে ভাবলো রনি।

"নো প্রোবলেম। নাইস টু মিট ইউ এশলি, আই আম রনি।"

হাত বাড়াতে গিয়েও সামলে নিল রনি, বাঙালি মন মানসিকতা তেড়ে উঠলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই। আর মেয়েটা হাত না বাড়ায় যদি, বেইজ্জতি হওয়ার ঝুঁকি সে নিতে চায় না।

"নাইস টু মিট ইউ টু, রনি। ইউ স্টুডেন্ট? একচুয়ালি আই আম গোয়িং টু স্টুডেন্টস' রেজ' ।"

নিজের গন্তব্য জানান দিল এশলি, মনে হয় ওর সাথে হাঁটতে চায়। সুযোগ ছাড়লো না রনি।

"হোয়াট আ কোইন্সিডেন্স, আই আম গোয়িং দেয়ার টু। উই ক্যান ওয়াক টুগেদার, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।"

একটু ভদ্রলোকী দেখানোর চেষ্টা করল ও, ছেলেদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসাটাই দস্তুর কিনা।

"রিয়েলি? দ্যাট উড বি গ্রেইট।"

এশলির মুখে বিস্ময়ের ঝলক দেখে ভেতরে ভেতরে সর্বনাশের শুরুর আঁচ পেল রনি। একবার সে দেখেছিল বটে সর্বনাশ, কোন এক নারীর চোখে। কিন্তু কথা রাখেনি সে, বুকে এখনো মাংসের গন্ধ নিয়ে সে একজন সাধারণ কেউ। রনির সেই প্রথম আর সেই শেষ। শেষ? হবে হয়তো, আজকেই যে শুরু হবে না কে জানে। স্রষ্টার কান্ডকীর্তি বড়ই রহস্যময়, একটু আশাবাদী হওয়ার চেষ্টা করে সে।

লাল বাতি জ্বলার সাথে সাথে জাদুমন্ত্রের মতো থেমে যায় গাড়িগুলো। পথচারী পাড়াপাড়ের বাতিটা জ্বলে যায়, বাতিটার নিচেই ডাউন কাউন্টারটা ৪৫ সেকেন্ড থেকে গোনা শুরু করে। রাস্তার দিকে ইশারা করে এশলি।

"শ্যাল উই?"

রনি মৃদু হেসে রাস্তার উপর পা বাড়ায়, পাশেই এশলি। রাস্তা পার হওয়ার পর নানা জিনিস নিয়ে টুকটাক কথা বলতে বলতে হাজির হয়ে যায় রেসিডেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে। এশলির দিকে ফিরে রনি, চোখে তার নেশা লেগেছে। দু'মাসের প্রবাস জীবনেই এরকম মিষ্টি একটা মেয়ে যেচে পড়ে তার সাথে কথা বলবে, ভাবতেও পারেনি ও।এই দেশের শীত নিয়ে কী যেন বলছিল এশলি, সামনে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রনি। মনে মনে সবটুকু সাহস একত্র করার চেষ্টা করল ও, বিদায় নেওয়ার আগে এশলির ইমেইল অথবা সেল- দুটোর কোন একটা তার নিতেই হবে। হঠাৎ করে কথা থামিয়ে দিল এশলি। কোমরের উপর এক হাত দিয়ে সিগারেটটাতে লম্বা একটা শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ফিল্টারটা। তারপর রনির দিকে তাকিয়ে একটা মোহনীয় হাসি দিল ও।

"ইউ ওয়ান্ট বিজনেস?"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না রনি, এতো মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে!!! তাও প্রথম বিশ্বের একটা দেশে, যেখানে কাজ না থাকলে সরকার মোটা অংকের ভাতা দেয়, সেখানে! হিসাব মেলে না রনির।

"পারডন মি..."

আরেকবার নিশ্চিত করে নিতে চায় ও, ঠিকই শুনেছে কিনা। মুখের হাসিটা এতোটুকু ম্লান হয় না এশলির।

"আই আস্কড, ইফ ইউ ওয়ান্টেড বিজনেস।"

হঠাৎ করেই যেন মর্ত্যলোকের আর দশটা মেয়ের মতো হয়ে যায় এশলি, রনির বিশ্বাসের বাঁধটাতে আর একটা ফাটল ধরে। তবু সামলে নেয় নিজেকে।

"নো থ্যাংকস।"

একটু কর্কশ শোনালো কি ওর কন্ঠ, অথবা আশা ভংগের জ্বালা? রনির নিজের উপর রাগ হয়।

"ডোন্ট ইউ লাইক মি? আই ক্যান ডু থিংস ইউ উইল নেভার ফরগেট।"

অনেকটা সামলে নিয়েছে রনি এর মধ্যে। ম্লান একটা হাসি খেলে যায় ওর ঠোঁটে, আরেকটা ব্যক্তিগত পরাজয় মনে নেয় ও।

"আই ডু, বাট আই ক্যান্ট।"

কথা বাড়ায় না এশলি আর, তাচ্ছিল্য আর কৃপার দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে। সিগারেটের জন্য আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রনিকে ফেলে এগিয়ে যায়। রনি ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আরেকটা সিগারেট ধরায়। দিনের শেষ সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে কষ্টগুলো উড়িয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় ঠান্ডার মধ্যে কাঁপতে থাকে রনি।

যুদ্ধ

অমিত

চুপচাপ বসে ছিল ছেলেটি। বনানী মেইন রোড থেকে প্রথম যে রাস্তাটি ডানে চলে গিয়েছে তার শেষ মাথায় একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে দুই হাটুতে মাথা গুজে কাঁদছিল। ক্লান্ত ও হতাশ। প্রায় দেড়দিন ধরে অভুক্ত। রাতে ভাল ঘুমও হয়নি। রেলস্টেশনের প্লাটফরমে কোনমতে চোখ বুঁজে ছিল। একদিকে ক্ষুধা আর অন্যদিকে ঠাণ্ডা। সঙ্গের ব্যাগে একটা মোটা জামা ছিল। তাও আগের দিন রাতে কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। শেষ সম্বল অল্প কিছু টাকাও ছিল তার মধ্যে। সেই থেকে না খাওয়া। গরিব সে, কিন্তু কখনো কারো কাছ থেকে চেয়ে খেতে হয়নি। তাই কারো কাছে সাহায্য চাইতেও পারেনি। এখন মনে মনে নিজেকে গালাগালি করছে। বাবার কথা শুনলেও ভাল হত। গ্রামের ছেলে, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে এই বছর, শহরে এসেছে একটা চাকুরির খোঁজে। বাবা গ্রামে ক্ষেতিবাড়ি করে। মা নেই,বাবাই সব। তার ইচ্ছা ছিল ছেলে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করবে আর বাকি সময় ক্ষেতের কাজ। বয়স হয়েছে, তার উপর এক পায়ে জোর পায় না বেশি।যুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর দোসরেরা অনেক অত্যাচার করেছে তাঁর উপর। যুদ্ধ শেষে অনেক দিন লেগেছে সারতে। তাও ডান পা টা আজো ঠিক হয়নি। তাই ছেলে যখন বলল শহরে গিয়ে চাকুরি করবে, তখন মন সায় দেয়নি। অনেক বুঝিয়েও রাজি করাতে না পেরে আল্লাহর নামে ছেড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ কোলাহল শুনে মাথা তুলল ছেলেটি। কিছু দূরে গলির ভিতরে একটা বাড়ির সামনে অনেক লোকের ভিড়। কী হচ্ছে বোঝা যাচ্ছেনা। যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। গিয়েই দেখা যাক ঘটনা কী।

বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রাণপ্রিয় নেতা হাজী শামসুজ্জামান খান সবাইকে জানাচ্ছে শুভেচ্ছা। বাড়ির সামনে বড় একটি ব্যানারে লেখাগুলো পড়ল। মনে পড়ল, তাই তো। আজ বিজয় দিবস। ভুলেই গিয়েছিল। গ্রামে থাকলে আজ বাবা তাকে নিয়ে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যেত। এই দিবসগুলো এলেই বাবা একটু অন্যরকম হয়ে যেতো। পুরনো হয়ে যাওয়া একটা কোট আর প্যান্ট পড়ে বাবু সাজত। আর ভোরবেলা উঠে তাকে নিয়ে বের হত। খুব মেজাজ খারাপ হত সকালে উঠতে। আর মেজাজ খারাপ হত বাবার কাণ্ড দেখে। কবরস্থানে গিয়ে নামহীন এক কবরের সামনে গিয়ে কাঁদত। কে জানতে চাইলে বলত তার বন্ধু। একসাথে যুদ্ধ করেছে। কোনদিন মায়ের কবরের কাছে যেতে দেখেনি। তাই রাগ লাগত। কোথাকার কোন লোক, না আত্মীয় না অন্যকিছু তার জন্য এতো। তাই শেষের দিকে যেতে চাইতনা। পরে বাবা আর জোর করেনি।

-এই যে ভাই এখানে কী হচ্ছে? বাড়ির সামনে দাঁড়ানো দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো।
-বিজয় দিবসের লঙ্গরখানা। বুড়ো দারোয়ান জবাব দিল।
-সেটা আবার কি?
-আরে মিয়া বুঝেন না। আইজকা বিজয় দিবস আছে তো। তাই খান সাহেব গরিব গুলা রে ভালমন্দ খাওয়াইব। আমগো খান সাহেবের বহুত বড় দিল আছে- এবার পাশ থেকে জবাব দিল একজন।
বুঝল সে। গ্রামে এই একদিন স্কুল মাঠে সরকারের পক্ষ থেকে গরিবদের খিচুরি খাওয়ায়। বাবা পাশের বাড়ির কদম চাচাকে নিয়ে মহা আনন্দে সেই খিচুরি খেতে যেত। তাকেও নিয়ে যেতে চাইত। কিন্তু তার খুব ঘেন্না লাগত। মনে হত কেউ তাদের দয়া করছে। আসলে ছোট বেলা থেকে এতো অভাব দেখে আসছে, তাই তার স্বপ্নই ছিল অনেক বড়লোক হবার। মানুষের দয়া দেখান তার একটুও সহ্য হতনা। আর সেই জন্যেইতো শহরে আসা। একদিন অনেক টাকা হবে তার, তখন সেই গরিবদেরকে দয়া করবে এ বিশ্বাস তার ছিল। এখন যদিও সময় তার পক্ষে কথা বলছে না তারপরেও তার বিশ্বাস তার স্বপ্নপূরণ হবেই। তার জন্য এখন তার দরকার একটু বিশ্রাম আর একবেলা ভালো খাওয়া। তাহলেই সে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করতে পারবে।

পাশের লোকটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সে। কী হল বুঝতে পারলনা। দেখল গেটটা খুলে গেল আর কিছু লোক ভিতর থেকে দুইটা বড় বড় হাড়ি ধরাধরি করে নিয়ে আসল। খাবারের গন্ধে চারদিক ভরে উঠল। পেটে পাক দিয়ে উঠল তার। মনে পড়ল দুদিন ধরে অভুক্ত সে। মনে হল সে একাই সব খেয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু এতো গরিবদের জন্য, আর সে গরিবদের খাবার ঘৃনা করে।

কিন্তু আর তো পারছেনা। কোনদিন অভুক্ত থাকেনি সে। ভালো হোক মন্দ হোক তার বাপ তাকে না খাইয়ে রাখেনি কোনদিন। তাহলে এখন কী হবে। সে কি যাবে ওদের সাথে খেতে ? কী আর হবে। কেউ তো আর তাকে চেনেনা। আর একবারই তো। এরপর তো সে চাকরি পাবে, বড়লোক হবে। তখন তো আর তাকে এভাবে খেতে হবেনা।

যাক আর চিন্তা করে লাভ নেই। বসেই পড়ি, ভাবল সে। এরইমধ্যে সবাই লাইন দিয়ে বসে পড়েছে। আর একজন লোক সবার সামনে কলাপাতা বিছিয়ে দিচ্ছে। সে বসে পড়ল লাইনের মাথায়। লোকটা একটা কলাপাতা ফেলল তার সামনে। ছেলেটা মাথা নিচু করে বসে থাকল। এরমধ্যে আরেকজন এসে খিচুরি দিয়ে গেল। গরম খিচুরি থেকে ধোয়া উঠছে। ছেলেটার মনে হল পৃথিবীর সবচেয়ে মজার খাবার এই খিচুরি। সে দেখল সবাই হাত না ধুয়েই খাওয়া শুরু করল। সে কোনদিন হাত না ধুয়ে খায়নি। আশেপাশে তাকাল কোথাও যদি পানি পাওয়া যায় হাত ধোবার জন্য। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ। মোটা থলথলে শরীর আর মাথায় ফেয টুপি।

-খান সাহেব জিন্দাবাদ। চিৎকার করে উঠল সবাই। ছেলেটিও তাকাল। চমকে উঠল। আরে এই সে লোক না। গত বছর স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে এই লোক না তাদের ইস্কুলে প্রধান অতিথি হয়েছিল। বাবাকে নিয়ে সেওতো ঐ অনুষ্ঠানে ছিল। অস্থির হয়ে উঠেছিল বাবা। তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল। অবাক হয়েছিল ছেলেটি। কখনোতো বাবা এরকম করেনা। কি হল আজকে। বাড়ি ফিরে বাবাকে

জিজ্ঞেস করতেই তার বাবা কেঁপে উঠল। কান্না ভেজানো গলায় বলল এই সেই লোক, যে তাকে একাত্তরে পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। আজকের হাজী শামসুজ্জামান খানই একাত্তরের ঐ এলাকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শামসু মিয়া। সে সময়ের হাজারো নিরীহ মানুষের খুনী এখন দেশদরদি নেতা।

হাত থেমে গেল তার। উঠে দাঁড়াল। পাশের লোকটি বলল,” কী হইছে মিয়া? খাইবা না?”

খাবারের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল ছেলেটি। তারপর হনহন করে হাঁটা দিল সামনের দিকে। না সে পারবেনা। সে পারবেনা তার বাবার অত্যাচারীর দেয়া খাবার খেতে। সে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। একাত্তরে তার বাবা যুদ্ধ করে বিজয় এনেছে। সে কখনই তা মুছে যেতে দেবে না।

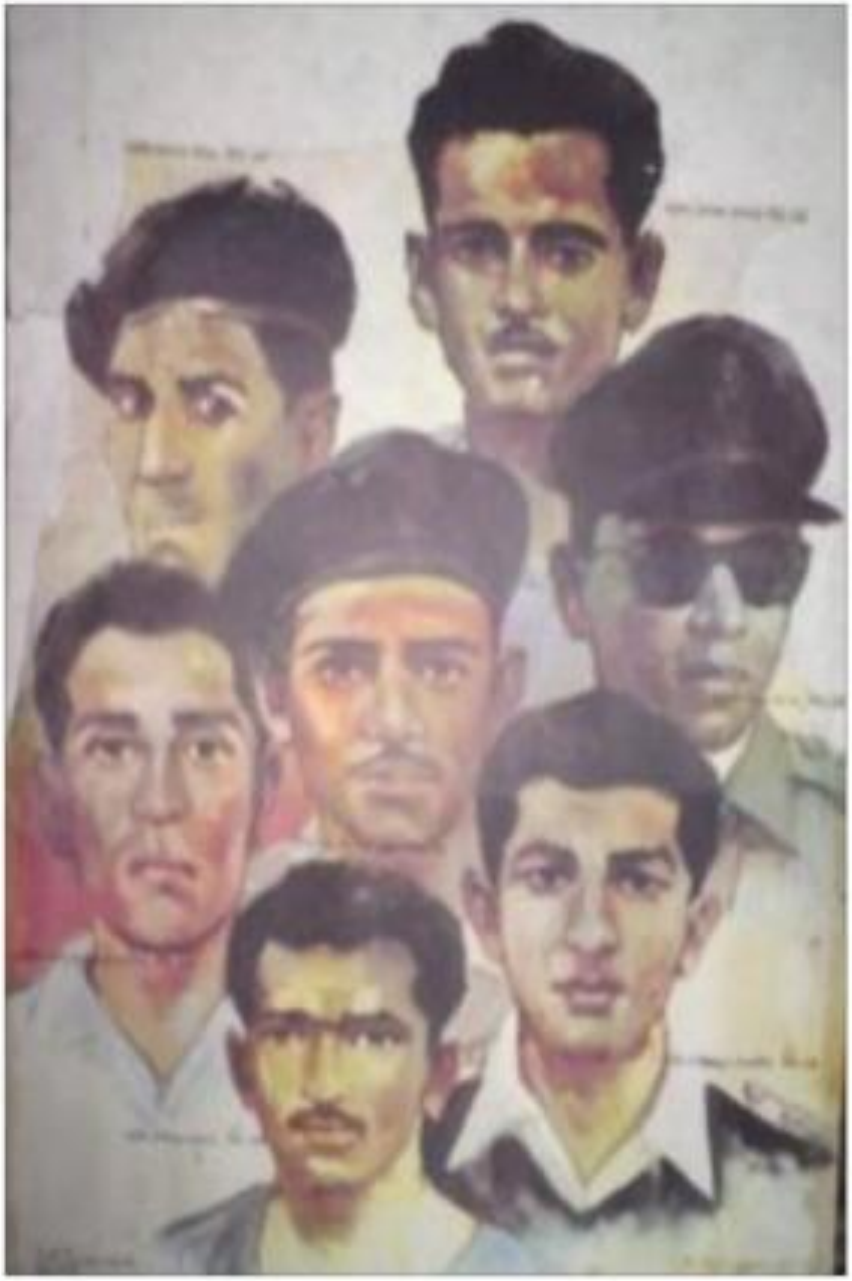

বাংলাদেশ স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত বিজয় দিবস,২০১১ এর স্মরনিকা। যোগাযোগঃ ইমেইলঃbsa_mun@yahoo.ca ওয়েবঃ www.mun.ca/bsa